সিনেমার শিল্পরূপ

তানভীর মোকাম্মেল

প্রথমা

CINEMAR SHILPARUP
A collection of writings on Bengali Cinema
By Tanvir Mokammel

First Punascha Edition
January, 2026

ISBN 978-81-7332-378-2

Price r 350

প্রথম পুনশ্চ সংস্করণ
জানুয়ারি, ২০২৬

প্রচ্ছদ ঃ সৌরীশ মিত্র

দাম r ৩৫০

পুনশ্চ, ১১৪ এন, ডা. এস. সি. ব্যানার্জি রোড, কলকাতা -৭০০ ০১০ থেকে
সন্দীপ নায়ক কর্তৃক প্রকাশিত এবং শিবানী প্রিন্টিং ১৭এ, স্যার গুরুদাস রোড,
কলকাতা - ৭০০ ০৫৪ থেকে মুদ্রিত ফোন - ৮৯১০২৮৩৪৪৮
Email: punaschabooks@gmail.com
Web: www.punaschabooks.com

আমার লেখালিখির ব্যাপারে
যাঁর অসীম আগ্রহ
সুশীল সাহা-কে

ভূমিকা

‘সিনেমার শিল্পরূপ’ বইটা ঢাকা থেকে ২০১৭ সালে ‘অনার্য পাবলিকেশন্স লি’ প্রথম প্রকাশ করেছিল। যেহেতু এপার বাংলার বই ওপার বাংলায় সব সময় তেমন সহজলভ্য নয়, তাই আমার অন্যান্য বইয়ের মতো ‘সিনেমার শিল্পরূপ’ বইটাও পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রকাশের ইচ্ছা ছিল আমার। কলকাতার *পুনশ্চ* প্রকাশনা এ ব্যাপারে এগিয়ে আসাতে আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।

‘সিনেমার শিল্পরূপ’ বইটার এই দ্বিতীয় সংস্করণে সিনেমা বিষয়ে আমার বড় কিছু প্রবন্ধ, সাক্ষাৎকার ও চলচ্চিত্র সমালোচনা থাকছে। যে সব লেখাগুলো সংস্করণের বাইরে সেগুলো হল; ‘সত্যজিৎ রায় এক অনন্য শিল্পীর পাঁচালী’, ‘ঋত্বিক ঘটকের সিনেমা: পূর্ব থেকে দেখা’, ‘আলমগীর কবির: বায়োস্কোপের দেশে একজন অতর পরিচালক’, ‘‘ ‘নদী ও নারী’-র কথা ’’, ‘‘ ‘সূর্য দীঘল বাড়ি’ সমাজবাস্তবতার নিরীখে ’’, ‘শেক্সপীয়ারের নাটকের সৃজনশীল চলচ্চিত্রায়ন’, ‘সিনেমার নন্দনতত্ত্বে অক্টোবর বিপ্লবের প্রভাব’, ‘ক্যালিগরী ও জার্মান এক্সপ্রেশনিস্ট সিনেমা’, ‘অপু ট্রিলজি: জীবনের বহমানতার এক মহাকাব্যিক চিত্র’, ‘‘ ‘মৃণাল সেনের ‘একদিন প্রতিদিন’ ’’, ‘‘ ‘৩৬, চৌরঙ্গী লেন’, শেক্সপীয়ার এবং ...’’, ‘সিনেমা ও সাহিত্যের আন্তঃসম্পর্ক: সমাজসত্যের আলোকে’, ‘বাংলাদেশের বিকল্প সিনেমা আন্দোলন: জমা, খরচ, ইজা’ ও ‘যৌথ সিনেমা কর্পোরেট পুঁজির কালে বিকল্প সিনেমার পথ’।

বইটা ভারতের পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমি আনন্দিত।

ঢাকা, ২০২৫ তানভীর মোকাম্মেল

সূচি

সত্যজিৎ রায় এক অনন্য শিল্পীর পাঁচালী	১১
ঋত্বিক ঘটকের সিনেমা: পূর্ব থেকে দেখা	২০
আলমগীর কবির: বায়োস্কোপের দেশে একজন অতর পরিচালক	৩৩
‘নদী ও নারী’-র কথা	৫৬
‘সূর্য দীঘল বাড়ি’: সমাজবাস্তবতার নিরিখে	৬৯
শেক্সপীয়ারের নাটকের সৃজনশীল চলচ্চিত্রায়ন	৮৭
সিনেমার নন্দনতত্ত্বে অক্টোবর বিপ্লবের প্রভাব	১১১
ক্যালিগরী ও জার্মান এক্সপ্রেশনিস্ট সিনেমা	১২৬
অপু ট্রিলজি: জীবনের বহমানতার এক মহাকাব্যিক চিত্র	১৩৫
মৃণাল সেনের ‘একদিন প্রতিদিন’	১৫২
‘৩৬, চৌরঙ্গী লেন’, শেক্সপীয়ার এবং ...,	১৫৬
সিনেমা ও সাহিত্যের আন্তঃসম্পর্ক: সমাজসত্যের আলোকে	১৫৯
বাংলাদেশের বিকল্প সিনেমা আন্দোলন: জমা, খরচ ও ইজা	১৬৮
যৌথ সিনেমা: কর্পোরেট পুঁজির কালে বিকল্প সিনেমার পথ	১৯০

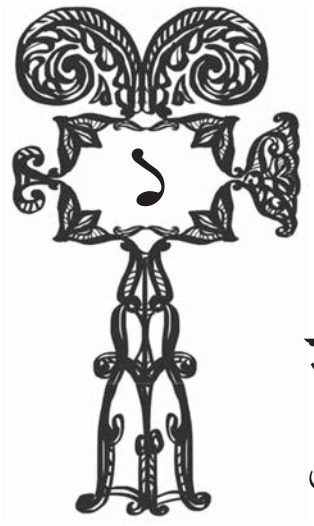

সত্যজিৎ রায়

এক অনন্য শিল্পীর পাঁচালী

জীবন এমন হওয়া চাই যেন মৃত্যুর মুহূর্তে বলতে পারা যায় যে, না, আমার জীবন বৃথা যায়নি। এ যুগে সত্যজিৎ রায়ের চেয়ে এ কথা কোন বাঙালি বেশি বলতে পারবেন? ছত্রিশটা ধ্রুপদমানের চলচ্চিত্র, চলচ্চিত্র বিষয়ক তিনটে গ্রন্থ, ছ'টা প্রফেসর শঙ্কু ও সতেরোটা ফেলুদা কাহিনি, দশটা শিশুতোষ গ্রন্থ, চারটে গ্রন্থের অনুবাদ, এ ছাড়া ''সন্দেশ'' পত্রিকা ও অন্যান্য সম্পাদনার কাজ, অসংখ্য বইয়ের প্রচ্ছদশিল্প অঙ্কন, সত্যজিৎ রায়ের কর্মতালিকার কি শেষ আছে?

প্রতিভা মানেই বহুমুখী। বা একটু ঘুরিয়ে বললে, বহুমুখীনতাই প্রতিভার প্রমাণ। কঁকতো ছবি না বানালেও লেখক হিসেবে বরেণ্য হতেন, বার্গমান নাট্য-পরিচালক হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন। আর পাশ্চাত্ত্যসঙ্গীতে বিশেষজ্ঞ, ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, ফেলুদা ও লালমোহন চরিত্র দু'টোর সৃষ্টি বা রে-রোমান টাইপের নির্মাণ, সত্যজিতের বহুমুখীনতাও, কতই না— বৈচিত্র্যময়!

প্রতিভার আরেক বড় লক্ষণ— ধারাবাহিকতা। একটা ভাল ছবি কেউ বানিয়ে ফেলতেও পারেন, কিন্তু একটার পর একটা বিশ্বমানের চলচ্চিত্র নির্মাণ করা, সৃজনশীলতার এই নির্ঝরতা— এ পিকাসীয়। তবে ভলতেয়ারের ওই বক্তব্যের সঙ্গে আমিও একমত যে, প্রতিভা বলে কিছু নেই। প্রতিভা মূলত তিনটে জিনিসের সমষ্টি— পরিশ্রম, পরিশ্রম, আর পরিশ্রম। সত্যজিতের ক্ষেত্রে এই গভীর পরিশ্রমমনস্কতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল আরো দু'টো বৈশিষ্ট্য,

পশ্চিমের যুক্তিবাদী নিষ্ঠা আর জীবনাচারণে উপনিষদীয় শৃঙ্খলা। এই সব মিলিয়েই সত্যজিৎ রায়।

নদীকে যেমন তার জল থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, একজন শিল্পীকেও তাঁর শৈলী থেকে আলাদা করা যায় না। শৈলীকে লুকিয়ে রাখাই যে সেরা শৈলী, রায়ের যে কোনো ছবিই তার প্রমাণ। আমরা যারা ছবি নির্মাণের চেষ্টা করছি তারা জানি, দেখতে সহজ হলেও রায়ের প্রতিটা ছবির প্রতিটা দৃশ্যের শটগুলোর পেছনে রয়েছে কী গভীর মেধা ও যন্ত্রের কত জটিল একেকটা সিঁড়িভাঙা অঙ্ক।

বাংলা চলচ্চিত্রের বয়স বেশ কয়েক দশক ('বিল্বমঙ্গল' ১৯১৯ ও প্রথম সবাক ছবি 'জামাইষষ্ঠী' ১৯৩১) হলেও চলচ্চিত্র তখন ছিল ক্যামেরা-থিয়েটার মাত্র (দুঃখের বিষয়, আজও প্রায় তাই!)। নাটকের মতই শানিয়ে তোলা সংলাপ, বানিয়ে তোলা কাহিনি, চিৎকৃত অভিনয়ের অতিনাটকীয়তা, গান, সেট— পুরোটাই এই কৃত্রিমতার জগৎ। এক সরল বালকের সরল কাহিনি তার সকল সারল্য দিয়ে জমজমাট কৃত্রিম এই জগৎটাকে একদিন উল্টে দিল— 'পথের পাঁচালী' (১৯৫৫)।

ঋজু, টানটান, মেদহীন চিত্রনাট্য রায়ের। বাঙালি মধ্যবিত্তের সহজাত আবেগি নাটুকেপনা ও সেন্টিমেন্টালিজম থেকে তা একেবারেই মুক্ত। সংলাপের গুণেই চরিত্রটা রূপ পেয়ে যায়। পরে যথার্থ ক্যামেরার অবস্থান, বুদ্ধিদীপ্ত, শট্ ডিভিশন, সঠিক ক্যামেরা কোণ, ও লেন্স, নিঁখুত সম্পাদনা ও সর্বশেষে অনন্য-আবহসঙ্গীত; এসবের ভেতর দিয়ে এই ঋদ্ধ চিত্রনাট্য পেয়ে যায় এক যথার্থ চিত্রভাষা। অভিনেতা-অভিনেত্রীর চাহনি, মুখের ভঙ্গি, কথার উচ্চারণ বা নীরবতাও, এসবের মাঝে শিল্প কোথায় লুকিয়ে আছে, রায়ের ক্যামেরা তা জানে— 'চারুলতা'। ওঁর প্রতিটা ছবির সম্পাদনার বয়ন এমন যে তা কোথাও, প্রচলিত কথায় যাকে আমরা বলি, সেই 'ঝুলে পড়ে' না, সংবেদনশীল দর্শকের মনোযোগ এক মুহূর্তের জন্যেও বিক্ষিপ্ত হয় না। এক নৈঃশব্দের কবি যেন রায়। কাহিনির চমক নয়, সংলাপ নয়, ক্যামেরার সঠিক কোণটা নির্বাচন, অভিনেতাদের অভিব্যক্তি, কম্পোজিশনের নান্দনিক সৌন্দর্য নিয়েই খোলা পালে তরতর এগিয়ে চলে ওঁর ছবি।

আর বিষয়বস্তু? রায়ের বিষয়বস্তু বৈভবে-বৈচিত্র্যে কতই না বিচিত্রগামী। আজ বার্গম্যানও যেখানে শুধুই ওঁর নানা আত্মজৈবনিক অভিজ্ঞতা শোনাতে ব্যস্ত, কুরোশাওয়া স্থির মধ্যযুগের সামুরাই জাপানে, সেক্ষেত্রে সত্যজিতের বিষয়বস্তু কতই না বিভিন্নমুখী। রয়েছে পিরিয়ড ফিল্ম—'সতরঞ্জ কে খিলৌড়ী', চেম্বার ফিল্ম—'চারুলতা', ফ্যান্টাসি ছবি—'গুপি গাইন বাঘা বাইন' বা 'হীরক রাজার দেশে', শিশুতোষ ছবি— 'সোনার কেল্লা'।

সেই ১৯২৯ সালে মুরারী ভাদুড়ীকে এক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন; ''ছায়াচিত্র এখনো পর্যন্ত সাহিত্যের চাটুবৃত্তি করে চলেছে তার কারণ কোন রূপকার আপন প্রতিভার বলে এই দাসত্ব থেকে তাকে উদ্ধার করতে পারেনি।'' বন্দি রাজকন্যাকে উদ্ধারের মতো সত্যজিৎ রায় এসে যে সেই উদ্ধারকার্যটা ঘটালেন, তা আজ বাঙালি সংস্কৃতির এক গৌরবময় ঘটনা। তবে চলচ্চিত্র ইমেজ বা চিত্রকল্প (রবীন্দ্রনাথ যাকে বলতে পছন্দ করতেন 'রূপের

চলৎপ্রবাহ') সৃষ্টি করবে, গল্প বলা তার কাজ নয়। আর তাঁর এই ন্যারেটিভ গল্প বলার প্রবণতার জন্যে সত্যজিৎ 'টোটাল সিনেমা'র দাবিদারদের কাছ থেকে সমালোচনাও পেয়েছেন। কিন্তু টোটাল থিয়েটার, টোটাল সিনেমা, কোথাও কি সফল হয়েছে? মানুষ সব শিল্পের কাছেই গল্প শুনতে চেয়েছে। অন্য যুগের, অন্য মানুষের গল্প। আসলে তার নিজেরই গল্প! সত্যজিৎ তাই দেখি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গেই তাঁর চলচ্চিত্রগুলোতে গল্প বলেছেন— মানুষের গল্প। অপু-দুর্গা-সর্বজয়া-ইন্দিরা-বিমলা-অনঙ্গবৌয়ের গল্প। বস্তুত সব শিল্পকর্মেই একটা কাহিনি, নিদেনপক্ষে কাহিনির একটা ইঙ্গিত থাকা চাই, অন্যথায় তো তা মানবেতিহাসের অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ, কোনো পর্যায়েই পড়বে না!

আর তাঁর এই গল্প বলার কারণেই রায়ের ছবিগুলো মূলত সাহিত্যনির্ভর— 'অপুত্রয়ী', 'চারুলতা', 'তিনকন্যা', 'ঘরে বাইরে', 'জন অরণ্য, 'জলসাঘর'। তবে সাহিত্য ছাড়াও ছবি করেছেন রায়— 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'।

আর গল্প বলার ক্ষেত্রে রায় প্লটে বিশ্বাস করেছেন। তবে প্লট অর্থে যেখানে অনেক চলচ্চিত্রকারই বোঝেন কাহিনির জট, রায়ের ছবি কাহিনির সেই ঘনঘটা থেকে মুক্ত। খুব কিছু কি ঘটে 'পথের পাঁচালী'-তে? আসলে চরিত্ররাই মুখ্য। কখনও কখনও মনে হয় টমাস হার্ডি বা জগদীশ গুপ্তের মতো এক অনিবার্য ঘটনাক্রমে যেন রায়ও বিশ্বাস করছেন, যেমন 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'-য় মিস্টার ব্যানার্জির বিবাহ প্রস্তাব অনিবার্য কারণে বারে বারেই বাধা পড়ায় ঘটনা ভিন্ন দিকে মোড় নেয়। তবে চরিত্ররাই আসলে ঘটনা সৃষ্টি করে, ঘটনার আবর্তে জড়িয়ে পড়ে, আবার সে আবর্ত থেকে মুক্তও হয়। ঘটনা নয়, নিয়তি নয়, মানুষই মূল। এই যে মানুষকে সব কিছুর কেন্দ্রে রাখা, এই শেক্সপীয়ারীয় বৈশিষ্ট্য, রায়ের ছবিকে অমর করবে।

চলচ্চিত্র সময়কে ভাঙতে, গড়তে, এগোতে, পেছাতে পারে, সবচেয়ে প্লাস্টিক আর্ট। তাই সাহিত্যনির্ভর হলেও অপুত্রয়ী হুবহু বিভূতিভূষণের কাহিনি নয়, 'চারুলতা' নয় 'নষ্টনীড়'। ছবির প্রয়োজনে কাহিনির নির্যাসটাই নেন রায়, খোলসটা নয়। আর পরিবর্তনটা যে সব সময় মাধ্যমজনিত কারণে করেছেন তেমনটাও নয়। বিষয়বস্তুগতভাবেও করেছেন। পরশুরামের গল্পের 'পরশপাথর'-য়ের উকিলকে কেরাণি বানিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথের 'পোস্টমাস্টার'-য়ের শেষ অংশ পাল্টে নিয়েছেন নিজের মতো করে। কতখানি আত্মবিশ্বাসী হলে একজন বাঙালি শিল্পী রবীন্দ্রনাথকেও পাল্টাতে পারেন!

একটা অভিযোগ আসে যে, ছবির বিষয়বস্তু বেছে নেয়ার ক্ষেত্রে রায় যেন কিছুটা অতীতচারিতার পরিচয় দেন। এটা ঠিক যে, ওঁর কলকাতা ট্রিলজি বা শেষ ছবিগুলো— 'গণশত্রু', 'শাখাপ্রশাখা' বা 'আগন্তুক' বাদে, তাৎক্ষণিক বর্তমানের চেয়ে রায় যেন সাম্প্রতিক অতীতের প্রতিই, ওঁর আগ্রহ বেশি দেখিয়েছেন। আসলে যে কোনো চলচ্চিত্রকারই হয়তো তাঁর ছবির জন্যে সেই যুগটাকেই বেছে নেবেন যার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তিনি গেছেন কিংবা অল্প কিছু দিন অতীত হয়েছে যে যুগ। তবে সব সময়েই তাঁর আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু থেকেছে যে শ্রেণিটাকে তিনি চিনতেন, সেই— বাঙালি মধ্যবিত্ত। এ মধ্যবিত্তকে তিনি নানাভাবেই

দেখিয়েছেন। দেখিয়েছেন তার পতনের কদর্যতা—'জন অরণ্য', তার উচ্চাকাঙ্ক্ষার সীমাবদ্ধতা— 'সীমাবদ্ধ', তার পলায়নের প্রান্তরেখা— 'অরণ্যের দিনরাত্রি', তার উত্তরণের সম্ভাবনা— 'মহানগর'। তবে মধ্যবিত্তের জীবনপ্রবাহের উপরিতলে যে একটা স্বল্পোচ্চার মৃদুতা রয়েছে, বিশেষ করে ব্যক্তি মানবমনের সূক্ষ্ম nuance-গুলো, তা চিত্রভাষায় রূপ দেবার ক্ষেত্রে রায়ের স্বাচ্ছন্দ্য অনন্য। তবে ভায়োলেন্স, হত্যা, যৌনতা বা সরাসরি সংঘাত, যেগুলোও এই অস্থির সময়ে এক ফিলিস্টাইন সমাজের অংশ বিশেষ, সেসব চিত্রায়নে রায়ের স্বাচ্ছ্যন্দ হয়তো সমমাপের হয়।

মূলত নাগরিক মধ্যবিত্ত ওঁর miliece হলেও বাংলার গ্রামকে রায়ের চেয়ে বেশি সফলতায় কেই বা পর্দায় তুলে ধরতে পেরেছেন? ঝাঁকা নিয়ে চিনিবাস মিষ্টিওয়ালা, তার পেছনে দুর্গা, তার পেছনে অপু, সবার পেছনে নেড়ি কুত্তাটা, জলে তাদের বিম্বিত ছায়া— চিরক্ষুধার, চিরসুন্দর বাংলার গ্রাম তার সকল রূপ নিয়ে উদ্ভাসিত হওয়ার জন্যে এমন একজন শিল্পীর প্রতীক্ষাতেই যেন ছিল। সত্যজিৎ কখনো গ্রামে বাস করেননি, কিন্তু যথার্থ অর্থেই নাগরিক ছিলেন বলেই গ্রাম-বাংলাকে তার সকল সুষমা ও সীমাবদ্ধতাসহ তুলে ধরতে পেরেছিলেন।

রায়ের বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে আরেকটা যে জিনিস বিশেষভাবে উল্লেখ্য তা হচ্ছে নারী চরিত্র সৃষ্টি ও তার যথার্থ উপস্থাপনা। কথাসাহিত্যে একটা কথা প্রচলিত আছে যে সমাজবাস্তবতা রচনার সাফল্যের কৌশলটা হচ্ছে যথার্থভাবে নারী চরিত্রগুলো আঁকতে পারা। এক্ষেত্রে রায়ের সাফল্য তুলনাহীন। স্মরণ করুন, সর্বজয়া-ইন্দিরা-দুর্গা-অনঙ্গ বৌ-রতন-মৃন্ময়ী, রায়ের ছবির সেই সব অসংখ্য নারী চরিত্রের কথা। সংবেদনশীল ও গভীর আত্মানুসন্ধানী কিছু নারীও রায় সৃষ্টি করেছেন; চারু (চারুলতা), বিমলা (ঘরে বাইরে), আরতি (মহানগর)। যে দেশে নারী আগে নারী তারপরে মানুষ— শরৎচন্দ্রের সেই দুর্ভাগা বঙ্গদেশে সত্যজিতের ছবিতে যে নারী আগে মানুষ তারপরে নারী হিসেবে এসেছে, এ তাঁর আলোকিত মননেরই প্রতিফলন।

প্রচলিত অর্থে সত্যজিৎ রায়কে অনেকেই হয়তো ইতালীয় নিওরিয়ালিজম আঙ্গিকের একজন পরিচালক বলবেন। হ্যাঁ, নিওরিয়ালিজমের যে সব বৈশিষ্ট্য, প্রামাণ্য বাস্তবতা, ডিটেল্‌স, আন্তঃমানবিক সম্পর্ক, মানব-পরিবারের চিত্রায়ন, মানবিক আশাবাদ, এসবই রায়ের ছবিরও বৈশিষ্ট্য। বস্তুত রায়ই নিওরিয়ালিজমকে সবচেয়ে সুদীর্ঘকাল ধারণ করে এসেছেন। যখন ভিসকন্তি, ডি সিকা মৃত বা এ ধারা থেকে অপসৃত, ফেলিনি অবচেতন যৌনতায় আত্মগত মনোজগৎকে খুঁজে ফিরেছেন— 'এইট অ্যান্ড হাফ', তখনও রায়, তাঁর শেষ জীবনেও, নিওরিয়ালিজমের সরল গল্প বলার আঙ্গিকে ছবি তৈরি করে গেছেন— 'আগন্তক'। বস্তুত শেষ মহিকনের মতো সত্যজিৎ রায়ই বোধ হয় বিশ্ব চলচ্চিত্রের শেষ নিওরিয়ালিস্ট।

আর শুধু তাই-ই নয়, ব্রেঁসর প্রভাবে নিওরিয়ালিজম যখন কখনো ক্রমশই এক নীরস প্রতীকী বাস্তববাদী ধারায় খুঁজে ফিরেছে জীবনের নির্যাস, রায় তখন এই ধারায় যোগ করেছেন এক মানবিক সুষমা ও লালিত্য— 'চারুলতা', 'অপুর সংসার'। আর এক্ষেত্রে বড় সহায়

হয়েছে রায়ের ছবির— গীতিময়তা। সত্যজিৎ, যিনি বলতেন; ''পাশ্চাত্য মার্গসঙ্গীতের রহস্য সন্ধান করতে করতেই চলচ্চিত্রের সত্য আমার কাছে ধরা পড়ে'', মনে করেন যে, চলচ্চিত্রের কাঠামো সাহিত্যের চেয়ে সঙ্গীতের বেশি কাছাকাছি। যেমন 'চারুলতা'র কাঠামো সাহিত্যের চেয়ে যেন সঙ্গীতের বেশী নিকটতর। 'চারুলতা'র কাঠামোটা, ওঁর নিজের ভাষায়— মোজার্টীয়। এই সাঙ্গীতিক কাঠামোবোধের অভাবকেই তিনি চিহ্নিত করেছিলেন প্রাক-'পথের পাঁচালী' ভারতীয় চলচ্চিত্রের এক বড় দুর্বলতা হিসেবে। সাঙ্গীতিক এই ছন্দোময় কাঠামোর গড়ন ছাড়াও রায়ের ছবির আবহসঙ্গীত অংশও সর্বদাই শ্রুতিনন্দন, সৌকর্য ও সুষমায় উদাহরণস্থানীয়। 'জলসাঘর', 'গুপী গাইন বাঘা বাইন', 'হীরক রাজার দেশে'-র সঙ্গীতময়তা বাঙালির গর্বের বস্তু, এবং 'তিনকন্যা' (১৯৬১) পরবর্তী ছবিগুলোর আবহসঙ্গীত, যা রায় নিজেই করেছেন, প্রমাণ করে যে রবিশঙ্কর বা ওস্তাদ বিলায়েৎ খাঁ ছাড়াই রায়ের সঙ্গীতচেতনা কত ঋদ্ধ, এবং চলচ্চিত্রে আবহসঙ্গীতের যথার্থ শৈল্পিক প্রয়োগের প্রশ্নে, রায়ের যে কোনো ছবিই, বিশ্বজুড়েই একটা টেক্সট ফিল্ম হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

পশ্চিমা মাপে রায়ের ছবির গতি শ্লথ, তবে তা রায়ের অধিকতর বাস্তববোধেরই পরিচায়ক। কারণ যে সামাজিক আবহটা ওঁর জগৎ সেই বাঙালি মধ্যবিত্তের জীবন বা আবহমান গ্রামবাংলার মানুষের জীবনের গতি শ্লথই। সময়ের ধারণা সংস্কৃতি থেকে সংস্কৃতিতে ভিন্নতর হয়। 'ব্রেথলেস' বা 'রেইনম্যান'-য়ে সময়ের যে গতি, 'পথের পাঁচালী' বা 'জলসাঘর'-য়ের সময়ের গতি সেই একই রকম হবে না নিশ্চয়ই। কারণ এদেশে আমাদের সামাজিক জীবনের গতিটাই অনেক ধীরলয়ের।

রায়ের ছবির আরেক বৈশিষ্ট্য— সূক্ষ্মতা। ক্লোজ আপে চারুর চাহনি, দুর্গার মৃত্যুর পর পুকুরঘাটে দাঁত মাজতে মাজতে অপুর থমকে যাওয়া, এইসব অতি সূক্ষ্মকাজ, রে-টাচ্, মানবমনের অন্তঃস্থিত অনুভুতিকে তুলে ধরে এক শিল্পিত প্রগাঢ়তায়। যে সহজ দক্ষতায় রায় 'চারুলতা'-র ত্রিভুজ সম্পর্ক বা 'অপরাজিত'-তে মা ও ছেলের আন্তঃমানবিক সম্পর্ককে এঁকেছেন, তা সূক্ষ্মতায়—চেখভীয়ই। তাই এটা আমাদের খুব বিস্মিত করে না যে, পশ্চিমা কোনো কোনো সমালোচক রায়কে, 'চলচ্চিত্রের চেখভ' বলতে পছন্দ করেছেন।

জীবনধর্মী ছোটখাটো সংলাপ রায়ের। ''ফিরিয়ে-দাও-আমার-হারিয়ে-যাওয়া-বারটি-বছর'' জাতীয় নাটকীয় সংলাপের কৃত্রিমতা থেকে রায় বাংলা চলচ্চিত্রকে কতই না বাস্তবনিষ্ঠ করেছেন। চলচ্চিত্রে সংলাপ functional। কথা মূলত ক্যামেরাই বলবে। সংলাপ সেটুকুই এবং সেভাবেই থাকা উচিত যেভাবে আমরা বাস্তব জীবনে কথা বলি। অপুত্রয়ীতে হয়তো বিভূতিভূষণের সংলাপদক্ষতা ওঁকে সাহায্য করেছে, কিন্তু অন্যত্র ওঁর ছবির সংলাপ সত্যজিৎ রায় নিজেই লিখেছেন, যা বাস্তবনিষ্ঠ ও চরিত্রানুগ।

রায়ের ছবির এক বড় বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিরকালই বিবেচিত হবে ওঁর অসীম ডিটেল্স-অন্বেষা। এ ডিটেল্স হতে পারে 'পথের পাঁচালী'-র ছেঁড়া চাদর, ইন্দিরা ঠাকরুণের টোল খাওয়া ঘটি থেকে 'চারুলতা' ও 'ঘরে বাইরে'-র ইঙ্গবঙ্গ-ভিক্টোরীয় আসবাবপত্রের হাজারো অনুষঙ্গ। ডিটেল্সের প্রতি এই গভীর আনুগত্য, এ ভারতীয় ঐতিহ্য। রায় নিজেই 'মহাভারত'-